টার্ম পেপার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ

Constitution of people's republic Bangladesh and its amendments: An analysis.

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

তত্ত্বাবধায়ক

লামিয়া ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

উপস্থাপনায়

মোঃ আনিছুর রহমান

বি.এস.এস (সম্মান)

অষ্টম সেমিস্টার (চতুর্থ ব্যাচ)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আইডি নং: ১৪-০-২৬-৮১০-০০৪

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্বাবদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮ সালের অষ্টম সেমিস্টরের বি.এস.এস (সম্মান) পরীক্ষার ৪৯৯ কোর্সের জন্য এই গবেষণা পত্রটি রচিত হয়েছে।

জমাদানের তারিখ: ০৪/০৫/২০১৮

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং বিশেষ করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক লামিয়া ইসলাম ম্যাডাম এর সহযোগীতায় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক গবেষণাটি প্রস্তুত করেছি।

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, এই প্রস্তুতকৃত গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত।

প্রণয়নকারী-

মোঃ আনিছুর রহমান

বি.এস.এস (সম্মান)

অষ্টম সেমিস্টার (চতুর্থ ব্যাচ)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আইডি নং: ১৪-০-২৬-৮১০-০০৪

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪

সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্বাবদ্যালয়, গাজীপুর- ১৭০৫।

প্রত্যয়ন পত্র

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষের অষ্টম সেমিস্টারের বি.এস.এস (সম্মান) কোর্স পরীক্ষার আংশিক শর্ত পূরণের জন্য মোঃ আনিছুর রহমান কর্তৃক প্রণীত এই টার্ম পেপার যার শিরোনাম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ।" বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮ সালের অষ্টম সেমিস্টরের বি.এস.এস (সম্মান) পরীক্ষার ৪৯৯ কোর্সের জন্য এই গবেষণা পত্রটি বিশেষভাবে প্রণীত হয়েছে।

আমি উক্ত গবেষণা কর্মটি যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, গবেষণার বিশ্লেষণের তথ্যসমূহ সে নিজ প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করেছে। আমি এই গবেষণা কর্মটির মূল্যায়নের সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

....

লামিয়া ইসলাম

সহকারী অধ্যাপক

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র যার সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনাবসানে ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটি সৃষ্টি হয়েছিলো, তার পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্য পীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় ঘটেছে দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ; এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃপৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সংবিধান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন ১৯৭২ সালের ৪ই নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ গণপরিষদে (বর্তমানে জাতীয় সংসদ) এই সংবিধান গৃহীত হয়, এবং একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর বা বাংলাদেশের বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী হতে এটি কার্যকর হয়। ২০১৪ সালের ১৬শ সংশোধনীসহ এটির মোট ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে। তবে এসব সংশোধনীর মধ্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনী, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সপ্তম সংশোধনী, ত্রয়োদশ সংশোধনী এবং ষোড়শ সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল করা হয়েছ। এই সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয় যা সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

গুণগত পদ্ধতির সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ও উপাত্তের আলোকে আমি আমার গবেষণার কাজ করছি। বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রায়নের উপাদানগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশ সংবিধান গণতন্ত্রায়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এই প্রশ্নকে সামনে রেখে সেটি নিরূপণে কাজ করছি। কারণ বাংলাদেশ সংবিধানের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা একটি নতুন ও বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণার বিষয় হচ্ছে "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ।" আমি এই বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করতে পেরে নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করছি। বাংলাদেশ সংবিধান ও সংশোধনীর ভিত্তিতে বাংলাদেশের মতো উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশে গণতন্ত্রায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা অধিক যুক্তিযোগ্য ও জাতীয় প্রয়োজন। স্বল্প সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক লামিয়া ইসলাম এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক ও শিক্ষিকার সহযোগিতায় আমার গবেষণা কর্মটি শেষ করতে পেরে তাঁদের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই মহা আল্লাহ তা'আলার দরবারে।

বিনীত

মোঃ আনিছুর রহমান

আইডি নং: ১৪-০-২৬-৮১০-০০৪

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৩-২০১৪

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৫।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ ভূমিকা ১

১.২ গবেষণার সমস্যা ২

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা ২

১.৪ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৩

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন ৩

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি ৪

১.৭ সাহিত্য পর্যালোচনা ৪-৬

অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি

২.১ বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ৭

২.২ অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মূল দিকসমূহ ৮

২.৩ গণপরিষদ আদেশ ৮

২.৪ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ৯

২.৫ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ৯

২.৬ খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত অনুমোদন ১০

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক কাঠামোর বিশ্লেষণ

৩.১ সংবিধানের সংজ্ঞা ১১

৩.২ ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ১২

৩.৩ বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ ১৪-২৪

৩.৪ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা ২৩

৩.৫ গণতন্ত্রায়নের সংজ্ঞা ২৫

৩.৬ বাংলাদেশ সংবিধান ও গণতন্ত্র ২৬-২৮

৩.৭ বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ ২৯-৩২

৩.৮ বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর রিভিউ ৩২

৩.৯ সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা (১৯৭৩-৭৫) ৩৪

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

৪.১ তথ্য ও উপাত্তের উৎস ৩৬

৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ ও সাহিত্য পর্যালোচনা ৩৬-৪০

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

৫.১ আলোচনা ৪১

৫.২ সুপারিশমালা ৪২

৭.৩ উপসংহার ৪৪

৭.৪ গ্রন্থপঞ্জি ৪৫

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ ভূমিকাঃ

সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এতে সরকারের গঠন, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসহ মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, এককথায় রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত থাকে। আধুনিককালে প্রতিটি রাষ্ট্রে সংবিধান আছে। ১৯৭১ সালের এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর "বিজয় দিবসে" স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ লাভ করে একটি সংবিধান। ২০১৪ সালের ১৬শ সংশোধনীসহ এটির মোট ১৬ বার সংশোধন করা হয়েছে **(রশিদ, ২০০১)**।

১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রতি লক্ষ্য করলে এটা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, বাংলাদেশের সংবিধানটি একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। এ সংবিধানের মধ্যদিয়েই বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে। পাশাপাশি বাংলাদেশের সংবিধানের একটি মূলনীতি হিসেবে গণতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এরপরও সংবিধানে "গণস্বার্থ" এবং "জাতীয় নিরাপত্তা" ও গণতন্ত্রায়নের ঘাটতি রয়েছে যা সংবিধানের পরিপন্থি বলে ধরে নেয়া হয়। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির মধ্যে গণতন্ত্রও কোন আইনগত মর্যাদা লাভ করতে পারে নি। তাছাড়া বাংলাদেশ সংবিধান ও সংশোধনী অনুযায়ী গণতন্ত্র জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চয়তা প্রদানে তেমন কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেছে, "সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলো নিতান্তই অপর্যাপ্ত। তিনি সংবিধানকে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি মৌলিক ধারা' বলে চিহ্নিত করেছেন। **(Holiday, Dhaka, October 22, 1972) (ভূঁইয়া, ১৯৮৯)**।

অতএব, তাই বাংলাদেশ সংবিধানের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা একটি নতুন ও বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রায়নের উপাদানগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশ সংবিধান গণতন্ত্রায়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এই প্রশ্নকে সামনে রেখে সেটি নিরূপণে গুণগত পদ্ধতির সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ও উপাত্তের আলোকে আমি আমার গবেষণার কাজ করছি।

১.২ গবেষণার সমস্যা

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্য পীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃপৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্র বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানে জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্রের সঠিক চর্চা হচ্ছে না। তাই **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ"** শিরোনামে বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রায়নের উপাদানগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে সেটি নিরূপণ করার লক্ষ্যে আমি এ গবেষণা করতে চাচ্ছি।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

একটি দেশের সংবিধান ও সংশোধনী অনুযায়ী সে দেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে ওঠে। সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গণতন্ত্র একটি সার্বজনীন শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। একটি দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত দীর্ঘদিন যাবত সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণ তাদের প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। কিন্তু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো সংবিধানে গণতন্ত্র প্রক্রিয়ার ধরণ নিরূপণ করা। তবে এ বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কোন মৌলিক গবেষণা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের মতো উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশে **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ"** এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা অধিক যুক্তিযোগ্য ও জাতীয় প্রয়োজন।

গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। কিন্তু জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে না। শাসন করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনী মোতাবেক জনগণের জন্য গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার ধরণ বা চেতনার বহিঃপ্রকাশ কতটুকু বিদ্যমান তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ প্রশ্নকে সামনে রেখে **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান**

ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ” বিষয়টিকে গবেষণার বিষয় (Research Topic) হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। ফলে এ গবেষণা দ্বারা একদিকে যেমন বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে তেমনি বাংলাদেশ সংবিধানে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া আরো সুগম হবে। তাছাড়া বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রকৃতভাবে প্রতিষ্ঠা হলে জনগণ সর্বাপেক্ষা সুফল অর্জন করবে। কাজেই বর্তমান সময়ে আমার এ গবেষণা যৌক্তিক ও নতুনত্বের দাবিদার।

১.৪ গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আমার এ গবেষণা দ্বারা বহুমুখী ও বহুবিধ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তবে আমার গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্রায়নের উপাদানগুলো চিহ্নিতকরণ এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে সেটি নিরূপণ করা। তাছাড়া আমার আরো অন্যান্য উদ্দেশ্য গুলোর মধ্যে হচ্ছে-

- বাংলাদেশ সংবিধান গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া নিরূপণে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে সেটি খুঁজে বের করা।
- বাংলাদেশ সংবিধান জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা চিহ্নিত করা।
- দ্বাদশ সংশোধনীতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে সেটি অনুসন্ধান করা।

সুতরাং এ গবেষণায় আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আমি গবেষণালব্ধ ধারণা দিতে সক্ষম হব। ফলশ্রুতিতে আমার এই গবেষণা প্রাথমিক যাত্রা হলেও বর্তমান সংবিধানে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা নিরূপণে আমার গবেষণা সঠিক নির্দেশনা দিতে সাহায্য করবে।

১.৫ গবেষণা প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ সংবিধান গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া নিরূপণে কিভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে?

২. দ্বাদশ সংশোধনী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে?

১.৬ গবেষণা পদ্ধতি

একটি গবেষণায় গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) আলোচনা করা বেশ কঠিন কাজ। কেননা ভিন্ন ভিন্ন গবেষণা বিভিন্ন ক্ষেত্রের ওপর অনেকগুলো গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ধারণা, সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমরা গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করি।সুতরাং আমি আমার গবেষণার বিষয়টির সঠিক বিশ্লেষণের জন্য গুণগত পদ্ধতি (Qualitative Method)-র সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ও উপাত্ত বা ডকুমেন্ট স্টাডিটি বেছে নিয়েছি। যা আমাকে সঠিক তথ্য বিশ্লেষণে সাহায্য করবে বলে আমি আশা করি।

১.৭ সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনা একটি অপরিহার্য অংশ। কেননা, গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক, জার্নাল, প্রবন্ধ ইত্যাদি থেকে অনেক ধারণা পাওয়া যায় যা গবেষণাকর্মকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। আলোচ্য বিষয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত তেমন কোন গবেষণাকর্ম পাওয়া যায় নি। তথাপি বিষয়টির সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত কিছু সাহিত্যকর্ম রয়েছে। আমি আমার গবেষণার বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সাহিত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে যেসব বইপুস্তক, প্রবন্ধ, জার্নাল, লেখকের প্রতিবেদন থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি উদাহরণস্বরূপ এগুলো কিছু সাহিত্য উপস্থাপন করা হলো-

বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশে ড. মোঃ শফিকুর রহমান বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র, ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, গণপরিষদ আদেশ, গণপরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন, খসড়া সংবিধান সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ, প্রস্তাবনা ও প্রজাতন্ত্র, সাংবিধানিক প্রাধান্য, রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কার্যাবলী, জাতীয় সংসদ ও ১৬টি সংশোধনী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন । এছাড়া তিনি বাংলাদেশ সংবিধানের পটভূমি ও সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এ গ্রন্থটিতে বাংলাদেশ সংবিধানে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া কিভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে সে বিষয়টি আলোচিত হয়নি **(রহমান, ১৯৯৮)**।

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে ড. আবুল ফজল হক সংবিধান প্রণয়ন ও খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি, গণপরিষদে বিতর্ক, সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সংবিধান লাভের পদ্ধতি, ১৯৭২ সালের সংবিধান ও বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, প্রস্তাবনা, বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানগুলোকে দশটি ভাগে বিভক্ত করে (যেমন-প্রথম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র, দ্বিতীয় ভাগঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি.....ইত্যাদির) ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন । দশম ভাগে তিনি সংবিধান সংশোধনী ও সংশোধন পদ্ধতির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং মোট ১৫টি সংশোধনীর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে এ গ্রন্থটিকে সংসদীয় গণতন্ত্রে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টি আলোচিত হয় নি **(হক, ২০০৭)**।

বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০ তে ড. হারুন-অর-রশিদ সংবিধান রচনার পটভূমি ও পদক্ষেপ, অস্থায়ী সংবিধান আদেশ, গণপরিষদের গঠন, কার্যক্রম ও সংবিধান প্রণয়ন, প্রস্তাবনা, বাংলাদেশ সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, পরিবর্তিত রূপ, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, মৌলিক অধিকার ও তাৎপর্য, সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ও আবশ্যকতা এবং সংবিধান সংশোধনী (পঞ্চম-দশম) ও ত্রয়োদশ সংশোধনীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ গ্রন্থে সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গণতন্ত্রায়নের কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নি **(রশিদ, ২০০১)**।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া সংবিধান রচনার প্রণয়নের ইতিহাস, গণপরিষদ আদেশ, গণপরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন, খসড়া সংবিধানের উপর রাজনৈতিক দলের অভিমত, খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত অনুমোদন, ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ও এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত বিধান, ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে জাতীয় সংসদ, সংবিধান সংশোধনী (১-১৩) সংশোধনীর কারণ ও প্রেক্ষাপট, সংবিধান সংশোধনী পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়াবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তবে এ গ্রন্থে গণতন্ত্রের কোন প্রসঙ্গই আসে নি **(ভূঁইয়া, ১৯৮৯)**।

সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, সাংবিধানিক আইন ও বাংলাদেশের সংবিধানে মোঃ মিজানুর রহমান বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র, ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান ও গণপরিষদ আদেশ, গণপরিষদের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন, খসড়া সংবিধান সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ, ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য ও বাংলাদেশ সংবিধানের বর্তমান বৈশিষ্ট্য, সংক্ষিপ্তাকারে ১৬টি সংশোধনী, বিস্তারিত ১৬টি সংশোধনী, বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানগুলোকে এগারোটি ভাগে বিভক্ত করে (যেমন-প্রথম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র, দ্বিতীয় ভাগঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি.....ইত্যাদির) ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে একাদশ ভাগে বিবিধ এবং ৭টি তফসিল বিদ্যমান। কিন্তু এখানে বাংলাদেশ সংবিধানে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন কার্যকর বিষয় রচিত হয় নি **(রহমান, ২০১১)**।

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এটি বাংলাদেশের মূল সংবিধান। অর্থাৎ এটি একটি অকাট্য দলিল। এতে সরকারের গঠন, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসহ মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, এককথায় রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত আছে। এতে সর্বমোট ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ৭টি তফসিল ও ১টি প্রস্তাবনা বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া এতে বর্তমান পর্যন্ত ১৬টি সংশোধনী আনায়ন করা হয়েছে। দ্বাদশ সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা উঠে আসলেও তা বর্তমান পর্যন্ত কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে কিনা তা অনুসন্ধান করা মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে **(বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১৬)**।

উপরোক্ত গ্রন্থ ও গবেষণাকর্মগুলো পর্যালোচনা করে দেখা গেল যে, আমার গবেষণার বিষয় **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ"** এর ওপর ভিত্তি করে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার ধরণ নিয়ে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। তবে এ বিষয়ের সাপেক্ষে পরোক্ষভাবে কিছু গবেষণাকর্ম বিদ্যমান যেগুলো আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি

২.১ বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি

প্রত্যেক স্বাধীন রাষ্ট্রে একটি সংবিধান থাকে, সংবিধানবিহীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এতে সরকারের গঠন, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসহ মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, এককথায় রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত থাকে। আধুনিককালে প্রতিটি রাষ্ট্রে সংবিধান রয়েছে। তেমনিভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের লিখিত সংবিধান বিদ্যমান আছে। বস্তুত সংবিধান একটি দেশের পথপ্রদর্শক। রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালার এক সমষ্টি হলো সংবিধান। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের বিজয় অর্জিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণার পর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাজধানী 'মুজিবনগর' থেকে ১০ এপ্রিল (১৯৭১) ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) অনুযায়ী দেশের মুক্তাঞ্চল পরিচালিত হয়। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপ্রধান করে গঠিত সরকার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। ১৯৭১ সালের এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর বাংলাদেশ প্রবাসী সরকার (Bangladesh Government in-Exile) ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখনও পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী তিনি স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। স্বদেশের প্রত্যাবর্তনের পরদিন ১১ই জানুয়ারি (১৯৭২) রাষ্ট্রপতির এক আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ (Provisional Constitutional Order of Bangladesh) জারি করেন। এ আদেশের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় সরকার (Parliamentary Government) প্রবর্তন করা হয়। অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশে আরও বলা হয় যে, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে প্রথম গণপরিষদ গঠিত হবে। গণপরিষদের সকল সদস্যগণের উপরই সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সংবিধান রচনার ভার অর্পণ করা হয় (ভূঁইয়া, ১৯৮৯)।

২.২ অস্থায়ী সংবিধান আদেশের মূল দিকসমূহ

অস্থায়ী সংবিধান আদেশের সমূহের মধ্যে বলা হয়-

(১) বাংলাদেশে সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠিত হবে।

(২) দেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা থাকবে। প্রধানমন্ত্রী হবে এর প্রধান।

(৩) গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন।

(৪) গণপরিষদ কর্তৃক সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত একজনকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করবেন।

(৫) একজন প্রধান বিচারপতি ও কয়েকজন বিচারপতি নিয়ে বাংলাদেশে হাইকোর্ট থাকবে **(রশিদ, ২০০১)**।

২.৩ গণপরিষদ আদেশ

১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি গণপরিষদ আদেশ জারি করেন। সরকার এই মর্মে ঘোষণা দেন যে, এ আদেশ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে কার্যকর করা হবে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যগণ গণপরিষদের সদস্য হবেন। এ আদেশে শূণ্য আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গণপরিষদ নিজেদের মধ্যে স্পীকার নির্বাচন করবেন। গণপরিষদের ১০০ জন সদস্য কোরাম (Quorum) গঠন করতে পারবেন।**(The Bangladesh Observer, March 24, 1972) (ভূঁইয়া, ১৯৮৯)**।

১৯৭২ সালের ৩০শে মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডক্টর কামাল হোসেন এক বিবৃতিতে বলেন যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান হবে সংসদীয় পদ্ধতির যাতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার মতো মৌলিক নীতিগুলো বিদ্যমান থাকবে। তিনি আরো বলেন যে, সংবিধানের খসড়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।**(The Bangladesh Observer, March 31, 1972) (ভূঁইয়া, ১৯৮৯)**।

২.৪ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন

স্বাধীনতা লাভের মাত্র ১১৬ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। নিঃসন্দেহে এ দিনটি জাতীয় জীবনের একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। সত্যিই নবীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। গণপরিষদ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১০ই এপ্রিল গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, গণপরিষদ সর্বাধিক কম সময়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে যার জন্য দেশে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ গৌরববোধ করবেন। উক্ত অধিবেশনে গণপরিষদের স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন। শাহ্ আবদুল হামিদ ছিলেন গণপরিষদের প্রথম স্পীকার; তাঁর মৃত্যুতে স্পীকার নির্বাচিত হন জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ।১৯৭২ সালের ১১ই এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিদ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গণপরিষদ এ অধিবেশনে চারটি কমিটি গঠন করেঃ

১. খসড়া সংবিধান কমিটি (Draft Constitution Committee);
২. কার্যপ্রণালীর বিধি সংক্রান্ত কমিটি (Rules of Procedure committee);
৩. অধিকার ও বিশেষ সুবিধা সংক্রান্ত কমিটি (Rights and Privileges Committee);
৪. পরিষদ কমিটি (House Committee) **(রহমান, ২০১১)**।

কমিটিগুলোর গঠন প্রস্তাবাকারে গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। তন্মধ্যে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন ডক্টর কামাল হোসেন। খসড়া সংবিধান সংক্রান্ত কমিটির প্রস্তাব উত্থাপন করেন মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী। পরিষদ কমিটি ছাড়া অপর তিনটি কমিটিকে ১০ই জুনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।***(The Bangladesh Observer, April 12, 1972.) (ভূঁইয়া, ১৯৮৯)**।

২.৫ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন

১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর বাংলাদেশ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। সেদিনই আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি (Awami League Organizing Committee) কর্তৃক উত্থাপিত একটি সংশোধনী। এই সংশোধনীর সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে খসড়া সংবিধান কমিটির সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন সংবিধানটিকে বিল আকারে গণপরিষদে পেশ করেন। তারপর দিনই অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর গণপরিষদ উক্ত সংশোধনীসহ সংবিধানের কার্যপ্রণালী সংক্রান্ত বিধিমালা গ্রহণ করে। গণপরিষদের বিলটির উপর বক্তব্য

করতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,“ এ সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত”(This constitution is written in martyr’s blood.) সংবিধানে যে কোন ধরণের সংশোধনী প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হবে বলে দৃঢ় আশা ব্যক্ত করেন। আইন মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেনের মতে, “এ সংবিধান হবে গণতান্ত্রিক, যাতে আইনের শাসন, মানুষের মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সাম্য এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার সকল নাগরিকদের জন্য অর্জিত হবে।”***(The Bangladesh Observer, October 13, 1972.) (ভূঁইয়া, ১৯৮৯)**।

২.৬ খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত অনুমোদন

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি (Draft Constitution Committee) মোট ৭৪টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৩০০ ঘন্টা ব্যয় করে এর রিপোর্ট প্রদান করে। রিপোর্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের কাছে প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। খসড়া সংবিধানের উপর আলোচনা শেষ হয় ৩০শে অক্টোবর ১৯৭২। সংবিধানের সংশোধনীসহ ১৬টি অনুচ্ছেদ গৃহীত হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য ১০টি অনুচ্ছেদও গৃহীত হয়। তবে সংবিধান বিলের বহু বিতর্কিত অনুচ্ছেদটি ছিল ৭০ নং অনুচ্ছেদ। ৩রা নভেম্বর ১৯৭২ সালে কতকগুলো সংশোধনীসহ খসড়া সংবিধানের সব অনুচ্ছেদ (Article) ও তফসিল (Schedule) গৃহীত হয়। এভাবে ১৮ অক্টোবর থেকে শুরু করে ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত খসড়া সংবিধানের প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ও তৃতীয় পাঠ সমাপ্ত হয়। সর্বশেষ পাঠ শেষে ৪ নভেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান সংক্রান্ত বিলটি গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর “ বিজয় দিবস” থেকে এটি কার্যকর করা হয়। এভাবে স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ লাভ করে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান **(হক, ২০০৭ ও রশিদ, ২০০১)**।

তৃতীয় অধ্যায়

তাত্ত্বিক কাঠামোর বিশ্লেষণ

৩.১ সংবিধানের সংজ্ঞা

সংবিধান হল একটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলসূত্র। সংবিধান বলতে মূলত কতগুলো লিখিত বা অলিখিত মৌলিক বিধিমালা কে বোঝায় যা কোন রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যবহার ও বন্টনের নীতি নির্ধারণ করে। একটি রাষ্ট্রের সংবিধান হল সেই রাষ্ট্রের দর্পণ বা প্রতিচ্ছবি যার মাধ্যমে সেই জাতির জীবন পদ্ধতি ফুটে উঠে। এটিকে বলা হয় রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন বা দলিল।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সংবিধানের সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরিস্টটলের মতে, "A constitution is the way of life the state has chosen for itself." **(Everson, 1996)**

মার্কিন সংবিধান বিশারদ ডাইসির মতে, "সকল প্রকার নিয়ম কানুন যা রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অনুশীলন বা ক্ষমতার বন্টন কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে তাকে সংবিধান বলা হয়।"

লেসলি লিপসন The Democratic Civilization-1969 গ্রন্থে বলেছেন, "সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রশাসনগত নিয়ম প্রণালী ও তার সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক সংবলিত একটি রাজনৈতিক প্রকল্প। বলা বাহুল্য, এই প্রকল্পের মূল কাঠামো হল লিখিত সংবিধান" **(Lipson, 1969)**।

লর্ড ব্রাইস এর মতে, "Constitution is the aggregate of laws and customs under which the life of the state goes on" (রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার জন্য আইন রীতিনীতির সমষ্টিকেই সংবিধান বলা হয়)।

সি এফ স্ট্রং বলেছেন, "A Constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the government and relation between the two are adjusted." (সংবিধান বলতে এমন কতিপয় নিয়ম কানুনের সমষ্টিকে বোঝায় যার দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়)

অর্থাৎ সংবিধান হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এতে সরকারের গঠন, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসহ মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক-সম্বন্ধ, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, এককথায় রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সংবিধান হল কতিপয় নিয়ম কানুন যা সরকার গঠন, দেশ পরিচালনা, সরকার ও জনগনের অবস্থান নির্ণয় এবং সর্বোপরি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলসুত্র হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে (রশিদ, ২০০১)।

৩.২ ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধান স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শুধু রচিত হয় নি, এর আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে- এটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সংবিধানগুলোর অন্যতম। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

১. **লিখিত সংবিধানঃ** ১৯৭২ সালের সংবিধানে ৮৩টি পৃষ্ঠায় সর্বমোট ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ, ৪টি তফসিল ও ১টি প্রস্তাবনা বিদ্যমান ছিল। এটি একটি লিখিত সংবিধান।

২. **দুষ্পরিবর্তনীয়ঃ** ১৯৭২ সালের সংবিধান একটি দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। তবে এটি কোন জটিল পদ্ধতির সংবিধান নয়। জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংবিধান সংশোধনী গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির মাধ্যমে তা কার্যকর করা হয়।

৩. **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাঃ** ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মতো কোন অঙ্গরাজ্য বা প্রদেশ নেই। জাতীয় সংসদের ৩০০ জন সদস্য প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

৪. **সংসদীয় গণতন্ত্রঃ** ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এটিকে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থাও বলা হয়। এর প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তবে রাষ্ট্রপতি হলেন নামে মাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রী পরিষদের হাতে। মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।

৫. **এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা:** বাংলাদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান। তা হলো জাতীয় সংসদ (**National Parliament**) । জাতীয় সংসদে ৩০০ জন সদস্য প্রত্যক্ষ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত এবং মহিলার ৩০টি সংরক্ষিত আসন (২০০১ সাল মুতাবেক) বিদ্যমান ছিল। এখন তা ৫০টি সংরক্ষিত আসনে উন্নীত করা হয়েছে। সদস্যরা ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

৬. **মৌলিক অধিকার নিশ্চিয়তা:** ১৯৭২ সালের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে প্রত্যেক নাগরিকদের জন্য কিছু মৌলিক অধিকারের নিশ্চিয়তা দেওয়া হয়েছে।

৭. **প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির ব্যবস্থা:** ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১১ নং অনুচ্ছেদে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

৮. **ন্যায়পাল বিধান:** ১৯৭২ সালের সংবিধানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি। সংসদ কর্তৃক এ পদ সৃষ্টি করে। ন্যায়পাল সকল মন্ত্রালয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তদন্ত করতে পারে (সংবিধানের ৭৭ নং অনুচ্ছেদ)।

৯. **সমাজতন্ত্রের বিধান:** ১৯৭২ সালের সংবিধানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার। বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে মূলনীতি হিসাবে ঘোষনা করা হয়। সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের বিধান বিদ্যমান।

১০. **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা:** সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, কর্ম ও দন্ড ইত্যাদির পরিচালনা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের কাছে ন্যস্ত।

১১. **সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা:** বাংলাদেশ সংবিধানে সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সংবিধান অনুসারে প্রধান বিচারপতি ও বিচারকগণ বিচার কার্য পরিচারনা করে। সংবিধানে এ ব্যাপারে নিশ্চিত ধারণা দেওয়া রয়েছে।

১২. **জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান:** ১৯৭২ সালের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এতে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিধান ছিল না। পরে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৩. রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি: ১৯৭২ সালের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলনীতিগুলো রাষ্ট্রের চেতনা হিসাবে কাজ করে।

১৪. জনগণের সার্বভৌমত্ব: ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী সকল ক্ষমতার উৎস হচ্ছে জনগণ (অনুচ্ছেদ ৭)।

১৫. সংবিধানের প্রাধান্য: ১৯৭২ সালের সংবিধান হলো বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন। এর সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বা অসঙ্গতিপূর্ণ আইন কার্যকরী হবে না বরং বাতিল হয়ে যাবে **(হক,২০০৭)**।

৩.৩ বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের লিখিত সংবিধান বিদ্যমান। ১৯৭১ সালের এক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৭২ সালের ১২ই অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল আকারে উত্থাপন করেন। এর নিয়ম অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং সর্বশেষ পাঠ শেষে ৪ই নভেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধান সংক্রান্ত বিলটি গণপরিষদে গৃহিত হয়। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর " বিজয় দিবস" থেকে এটি কার্যকর করা হয়। এভাবে স্বাধীনতার মাত্র ১০ মাসের মধ্যে বাংলাদেশ লাভ করে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান **(রশিদ, ২০০১)**।

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হয়েছে। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তিত হয়। তবে ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আবির্ভাব ঘটে। আবার ১৯৯১ সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু বর্তমান সংবিধানের সংসদ সদস্যগণের দল পরিবর্তনের উপর কঠোর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে বলে কার্যত তিনি কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। কালাক্রমে বর্তমানে আমাদের সংবিধান যে অবস্থায় পৌঁছেছে তার তুলনায় ১৯৭২ সালের সংবিধানটি ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষা **(রহমান, ১৯৯৮)**।

বাংলাদেশ গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া নিরূপণে বাংলাদেশ সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের আলোচনা করা হলোঃ

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রস্তাবনা-

"আমরা বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ সালে মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি।

আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।

আমরা আরো অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যেখানে রাষ্ট্রের সকল জনগণ আইনের শাসন, মৌলিক অধিকার, মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।

আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমরা যাহাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি। মানবজাতির প্রগতিশীল আশা-আকাঙ্খার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারি, সেইজন্য বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান আমাদের পবিত্র কর্তব্য..." **(রশিদ, ২০০১)**।

এই সংবিধানে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, মুক্তিযুদ্ধে জনগণের বীরত্বপূর্ণ লড়াই, সংবিধানের মূলনীতি বা আদর্শ, অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় চেতনা, সংসদীয় গণতন্ত্র দ্বারা দেশ শাসন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সমুন্নত রাখা, আন্তর্জাতিক শান্তি ও সাহায্যের জন্য পূর্ণ অঙ্গীকার এবং সাংবিধানিক প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বসহকারে উল্লেখিত হয়।

অতএব, এই সংবিধানে 'বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তি স্বরূপ; তাঁর প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখা এবং তা রক্ষণাবেক্ষন, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান সকলের পবিত্র কর্তব্য। গণপরিষদ এই সংবিধান রচনা ও গ্রহণ করে, কিন্তু গণপরিষদের ক্ষমতা মৌলিক নয়। এই ক্ষমতা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত এবং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী-প্রস্তাবনায় এ নীতির স্বীকৃতি রয়েছে। এই সংবিধান সার্বভৌম জনগণের সামগ্রিক ইচ্ছার অভিব্যক্তি। সুতরাং এটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন এবং তার প্রাধান্য রক্ষা সকলের পবিত্র কর্তব্য (হক,২০০৭)।

বাংলাদেশ সংবিধানে প্রজাতন্ত্র

সংবিধানের প্রথম ভাগে ৭টি অনুচ্ছেদ বিদ্যমান। এতে রাষ্ট্রের নাম, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা, প্রকৃতি, রাষ্ট্রভাষা, রাজধানী, জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক, নাগরিকত্ব এবং সংবিধানের প্রাধান্য সম্পর্কে বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আমাদের রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হবে (অনুচ্ছেদ-১)।

১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল এলাকা নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত ছিল এবং যে সকল এলাকা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের এলাকাভুক্ত হতে পারে সে সকল এলাকা বাংলাদেশের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হবে (অনুচ্ছেদ-২)। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম হবে ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করবেন (অনুচ্ছেদ-২ক)।

প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা (অনুচ্ছেদ-৩)।

জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা, প্রতীক (অনুচ্ছেদ-৪)।

- প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত " আমার সোনার বাংলা"-র প্রথম দশ চরণ (অনুচ্ছেদ-৪ক)।
- প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা হচ্ছে সবুজ ক্ষেত্রের উপর স্থাপিত রক্তবর্ণেও একটি ভরাট বৃত্ত (অনুচ্ছেদ-৪খ)।

- প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হচ্ছে উভয় পাশে ধান্যশীষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় ফুল শাপলা, তার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত পত্র, তার উভয় পাশে দুইটি করে তারকা (অনুচ্ছেদ-৪গ)।

প্রজাতন্ত্রে রাজধানী ঢাকা এবং তার সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে (অনুচ্ছেদ-৫)

১৯৭২ সালের সংবিধানে বলা হয় বাংলাদেশে নাগরিকগণ 'বাঙালি' বলে পরিচিত হবেন। তবে পঞ্চম সংশোধনীর দ্বারা নাগরিকগণ 'বাংলাদেশী' বলে অভিহিত করা হয়। জাতি হিসাবে আমরা বাঙালি (অনুচ্ছেদ-৬)।

সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল হয়ে যাবে (অনুচ্ছেদ-৭) (হক,২০০৭)।

সাংবিধানিক প্রাধান্য

সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে। জনগণের পরম অভিব্যক্তিরূপে সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্রপূর্ণ হয় তাহলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্রপূণ ততখানি বাতিল হবে।

কিন্তু ছাব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সংবিধানের প্রাধান্য রক্ষিত হয় নি। অবৈধ ক্ষমতা দখলকারী সেনানায়ক বা সেনা অভ্যুত্থানকারী বা সেনা অভ্যুত্থানকারদের সহযোগী ষড়যন্ত্রকারী রাজনীতিবিদগণ দেশের সর্বোচ্চ আইন (সংবিধান) কে লঙ্ঘন করে সংবিধান বহির্ভূত কার্যক্রম যথাঃ স্বঘোষিতভাবে রাষ্ট্রপতির পদ দাবি করা, সামরিক আইন জারি করাবা সংবিধান স্থগিত করার মাধ্যমে সংবিধানের প্রাধান্য লঙ্ঘন হয়েছে। সংবিধানের ৭ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সামরিক আইন এখতিয়ার বহির্ভূত (Ultravires) এবং Void ab initio। সংবিধানের কোথাও সংবিধান স্থগিত রেখে সামরিক আইন জারি বিধানের উল্লেখ করা হয় নি। তাছাড়া সামরিক আইন জারি জনগণের মনে ভীতির সঞ্চার

জাগায়। গণতন্ত্রের কার্যকারিতার জন্য সাংবিধানিক প্রাধান্য লঙ্ঘনকারীদে কে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে তাদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করা উচিত **(রহমান, ১৯৯৮)**।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (অনুচ্ছেদ ৮-২৫) রাষ্ট্র পরিচালনার কিছু মূলনীতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি সম্পর্কে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "যে সকল মহান আদর্শ বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

জাতীয়তাবাদ হলো একটি চেতনা। বিভিন্ন উপাদান নিয়ে একটি নির্দিষ্ট জনসমষ্টির মাঝে এই চেতনা বা ঐক্যবোধ সৃষ্টি করে, যা তাদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করে। তাদের মাঝে ভিন্ন সত্তা বা পরিচয় এনে দেয়। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বাংলাদেশ সংবিধানে (অনুচ্ছেদ-৯) বলা হয়, "ভাষা ও সংস্কৃতিগত একক সত্তা বিশিষ্ট যে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ ও সংকল্পবদ্ধ সংগ্রাম করে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করেছে, সেই বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।" সুতরাং আমাদের জাতীয়তবাদ হবে বাঙালি জাতীয়তাবাদ **(রশিদ, ২০০১)**।

১০ অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয় যে, মানুষের উপর মানুষের শোষণ হতে মুক্ত করে ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো রাষ্ট্রের লক্ষ্য। বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের অর্থ হলো বাংলাদেশে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে উৎপাদন যন্ত্র ও উপকরণ এবং বণ্টন ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ন্যস্ত থাকে। সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, উৎপাদন যন্ত্র ও উপকরণ এবং বণ্টন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানা থাকবে। মূলত বাংলাদেশ সংবিধানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষণমুক্ত সমাজ লাভের জন্য সমাজতন্ত্র গৃহীত হয় **(হক,২০০৭)**।

গণতন্ত্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা জনগণের অংশগ্রহণ, সম্মতি ও জবাবদিহিতার ভিত্তিকে পরিচারিত হয়। গণতন্ত্র হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাধান মূলনীতিগুলোর একটি। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ সংবিধানের **১১** অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'প্রজাতন্ত্র (বাংলাদেশ) হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্য এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকবে।'**(রশিদ, ২০০১)**।

বাংলাদেশের সংবিধানে অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে ধর্মরিপেক্ষতা। অনেকে এর দ্বারা ধর্মহীনতা বুঝে থাকেন। তবে এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষ অবস্থান, অর্থাৎ ধর্ম থাকবে; তবে ধর্মের কারণে রাষ্ট্র কোন ধরনের পক্ষপাতিত্ব করবে না। অতএব, রাষ্ট্র ধর্মের কারণে কারও অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। সুতরাং বলা যায়, ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ তে বলা হয়-

১. সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ;
২. রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান না করা,
৩. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মেও অপব্যবহার বন্ধ,
৪. এবং কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচারণ না করা ইত্যাদি মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।

রাষ্ট্রীয় প্রধান চারটি মূলনীতি ছাড়াও রাষ্ট্র পরিচারনার জন্য যে সব নীতি বাংলাদেশ সংবিধানে বিদ্যমান-সেগুলোর মধ্যে-বিচার বিভাগের স্বাধীনতা মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, কর্মের অধিকার, অভিন্ন শিক্ষা পদ্ধতি, বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও নাগরিকদের মধ্যে সমতা সৃষ্টি ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য **(রশিদ, ২০০১)**।

বাংলাদেশ সংবিধানে জনগণের মৌলিক অধিকার

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি দেশের নাগরিকগণ বেশ কিছু মৌলিক অধিকার ভোগ করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬-৪৭ অনুচ্ছেদে জনগণের মৌলিক

অধিকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার পরিপন্থি কোন কাজ করে না। রাষ্ট্রের সকল নাগরিকগণই মৌলিক অধিকার প্রাপ্য। এইজন্য বাংলাদেশ সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন বাতিল বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১. **আইনের দৃষ্টিতে সমতা:** সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান। অর্থাৎ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার ভোগ করবে।

২. **আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার:** বাংলাদেশের সকল নাগরিকের আইনের কাছে আশ্রয় লাভের অধিকার আছে।

৩. **ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার:** আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৪. **চলাফেরা অধিকার:** চলাফেরা জন্য নাগরিকগণের চলাফেরার স্বাধীনতা রয়েছে। বাংলাদেশের সর্বত্র অবস্থান করার অধিকার নাগরিকগণের আছে।

৫. **মতামত প্রকাশের অধিকার:** আইন অনুসারে সকল নাগরিকের মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। তবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশ করা যাবে না।

৬. **বসবাস করার অধিকার:** বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের রাষ্ট্রের সর্বত্র বসবাস করার অধিকার আছে।

৭. **সম্পত্তির অধিকার:** আইনের দ্বারা আরোপিত বাধা নিষেধ সাপেক্ষে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর করার অধিকার আছে। বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ দখল, গ্রহণ করা যাবে না।

৮. **ধর্মীয় অধিকার:** বাংলাদেশের সকল নাগরিক তাদের নিজস্ব ধর্ম পালন করার অধিকার রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি নাগরিক তাদের ধর্ম পালন করতে পারবে।

৯. **সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার:** দেশের যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পন্ন সকল নাগরিকের সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার রয়েছে।

১০. দায় মুক্তি-বিধানের অধিকারঃ প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে কোন কার্য করে থাকলে সংসদ সে ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করতে পারবেন **(রশিদ, ২০০১ ও হক,২০০৭)**।

বাংলাদেশ সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ

বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে গঠিত। সকল ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিসভার হাতে তথা প্রধানমন্ত্রী সকল ক্ষমতার অধিকারী। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়। এটিকে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থাও বলা হয়। এর প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তবে রাষ্ট্রপতি হলেন নামে মাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রী পরিষদের হাতে। মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী। অর্থাৎ ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা বাংলাদেশের নির্বাহী বিভাগ সংসদীয় গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়াকে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার দ্বারা পরিচালিত করে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশ সংবিধানে জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা বিদ্যমান। তা হলো জাতীয় সংসদ (**National Parliament**)। জাতীয় সংসদে ৩০০ জন সদস্য প্রত্যক্ষ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত ও মহিলার ৫০টি সংরক্ষিত আসন বিদ্যমান। সংসদের মেয়াদকাল ৫ বছরের জন্য। সংসদীয় গণতন্ত্রে গণতন্ত্রায়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য জাতীয় সংসদের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতীয় সংসদ ছাড়া বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব নয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ সদস্য আইন প্রণয়ন বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় আইন ও নাগরিক অধিকার প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবিধানের ৬৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের বিধানবলীর সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা জাতীয় সংসদেও হাতে ন্যস্ত থাকে এবং ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একমাত্র জাতীয় সংসদ সংবিধান সংশোধন করতে পারেন। তবে সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সংবিধানের কোন বিধান সংশোধনের লক্ষ্যে আনীত যে কোন বিল সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে এটি আইনে পরিণত হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানে নির্বাচন

১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনী সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি এর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে একাধিক রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধি বাছাই করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সংসদীয় সরকার গঠন করে। নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভার পদগুলো পূরণ হতে হয় এবং কখনো কার্যনির্বাহী ও বিচারব্যবস্থা ছাড়াও আঞ্চলিক ও স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি বাছাইও নির্বাচনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিনিধি বাছাইয়ের উপায় হিসেবে নির্বাচনের সার্বজনীন ব্যবহার হচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন হলো জনগণ দ্বারা ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি বাছাই করা। জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশ সংবিধানের **১১৮** অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অনাধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত এবং **১২৪** অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে সংসদ আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার সীমা নির্ধারণ, ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সংসদের যথাযথ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়সহ সংসদের নির্বাচন সংক্রান্ত সকল বিষয় বিধান প্রণয়ন করতে পারেন **(রহমান,২০১১)**।

অতএব, **১৯৭১** সালের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্য পীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃপৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান এদেশের গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এরপর সংবিধানে বাংলাদেশের পরিবর্তিত অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে **২০১৪** সালের মধ্যে **১৬**শ সংশোধনীসহ সর্বমোট **১৬**টি সংশোধনী আনায়ন করা হয়েছে। তবে এসব সংশোধনীর মধ্যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পঞ্চম সংশোধনী, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সপ্তম সংশোধনী, ত্রয়োদশ সংশোধনী এবং ষোড়শ সংশোধনী সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক বাতিল করা হয়েছ। এই সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদ সদস্যদের মোট সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয় যা সংবিধানের **১৪২** নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তবে সংবিধানের অনুচ্ছেদ **৭**খ তে বলা হয়ছে সংবিধানের **১৪২** নং অনুচ্ছেদে যাই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল

অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদের বিধানবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে।

৩.৪ গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

বাংলা "গণতন্ত্র" পরিভাষাটি ইংরেজি (Democracy) ডেমোক্রেসি শব্দ থেকে এসেছে। এই ইংরেজি শব্দটি আবার এসেছে ফরাসী শব্দ (Democratia) থেকে, যার অর্থ গ্রীক শব্দে বুঝানো হয় জনগণের (Demos), ক্ষমতা (Kratein)। অর্থাৎ 'গণতন্ত্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জনগণের ক্ষমতা। অর্থাৎ সরকার বা শাসন ব্যবস্থা যখন জনগণের অভিমত দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তার মানে সরকার পরিচালনায় যখন জনগণের অভিমত প্রতিফলিত হয় তখন উক্ত শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক সরকার বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বলা হয়। আমেরিকার তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন তাঁর 'গেটিসবার্গ এড্রেস, ১৮৬৩' -এ বলেছিলেন, "গণতন্ত্র জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার।" (Democracy is a government of the people, by the people, and for the people.) (আহমদ, ২০১৭)।

গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন জন বিভিন্ন অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, "গণতন্ত্র এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেক সদস্যের অংশগ্রহণ রয়েছে।" এ অংশগ্রহণ কথাটিও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এখন দেখা যাক, গণতান্ত্রিক সরকার বা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কিভাবে জনগণ সরকার পরিচালনায় বা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। পদ্ধতিগত গণতন্ত্রের ধারণার জনক জোসেফ সুম্পিটারের লক্ষ্য হচ্ছে, গণতন্ত্র-সম্পর্কিত 'অস্পষ্ট ধারণা' থেকে সরে এসে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিমাপ করা যায়, এমন সব সুস্পষ্ট নির্ণায়ক চিহ্নিত করা। তিনি গণতন্ত্রকে বর্ণনা করেন নেতৃত্ব নির্বাচনের ব্যবস্থা হিসেবে। সুম্পিটার বলেছেন:

The democratic method is that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for people's vote. **(সুম্পিটার, ১৯৫০: ২৬৯)**

অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি হচ্ছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, যেখানে জনগণের ভোট পাওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ করে। সহজ ভাষায় সুম্পিটারের কাছে গণতন্ত্র হলো, যারা সিদ্ধান্ত নেবে, তাদের নির্বাচনের ব্যবস্থা। এই সংজ্ঞায় পদ্ধতিগত দিকটিই যে প্রাধান্য পেয়েছে, তা সহজেই লক্ষণীয়।

(প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল ২০১৭)

গণতন্ত্রকে বিবেচনা করা হয় প্রগতিশীল ও আলোকিত সরকারের প্রতিচ্ছবি হিসেবে। শিক্ষিত নির্বাচকমন্ডলীর ওপর সঠিক গণতন্ত্র নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জেফারসনের মতে, "গণতন্ত্র সত্যিকার সভ্যতার এমন এক পর্যায়ের ওপর নির্ভরশীল যেখানে সভ্য জনগণ অন্যের অধিকার ও প্রয়োজনকে সম্মান করতে জানে।"

গণতন্ত্র একমাত্র সরকার পদ্ধতি যেখানে রাজতৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তাদের অভিমত প্রকাশের অধিকার লাভ করে এবং নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করে। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপক সুযোগ বিরাজমান।

অর্থাৎ গণতন্ত্র হচ্ছে রাজনৈতিক চর্চার স্বাধীনতা, বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে নিশ্চয়তা দেয়ার সুযোগ খোলা মনে গণতন্ত্রের চর্চা, সংরক্ষণ ও শিক্ষার স্বার্থে নিয়মিত নির্বাচন, জনপ্রিয় পদ্ধতিতে ভোট দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার যেখানে বলপ্রয়োগ বা দমননীতির কোন অবকাশ থাকবে না। বাস্তবে গণতন্ত্রে যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে সমাজের সব স্তরের মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দান। **(ধীরাজ কুমার নাথ, ২০০৯)**

৩.৫ গণতন্ত্রায়নের সংজ্ঞা

গণতন্ত্রায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক শাসনকে অগণতান্ত্রিক থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে রূপান্তর করে। অর্থাৎ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র বিস্তার যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় তাই গণতন্ত্রায়ন। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত, খ্যাতনামা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রবার্ট ডাল তার Democracy and Its critics গ্রন্থের সতেরো ও আঠারো অধ্যায়ে গণতন্ত্রের জয়যাত্রা সম্পর্কে প্রাণবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন, তা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধু গণতন্ত্রের ইতিহাস বর্ণনা করেন নি, সম্ভাবনাময় এই জীবনব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তৃতি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বানী উচ্চারণ করেছেন তা অত্যন্ত আকর্ষনীয়। গণতন্ত্রকে তিনি 'গণতন্ত্র' বলেন না। তিনি গণতন্ত্রকে চিহ্নিত করেছেন বহুকেন্দ্রিক ব্যবস্থারূপে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেন এক মহান বৃক্ষ বিশেষ। চারাগাছটি রোপিত হয়েছে প্রাচীনকালে, গ্রিসের সামাজিক ক্ষেত্রে। যুগে যুগে তা বিকশিত হয়েছে বিশ্বব্যাপী। শেষ পর্যন্ত তা একটি সার্বজনীন শাসন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক দিক নির্দেশনারূপে, শাসন ব্যবস্থার বৈধতা দানকারী হিসেবে গণতন্ত্রে গণতন্ত্রায়নের ভূমিকা অপরিসীম। তাই দেখা যায়, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও গণতান্ত্রিক রূপে চিহ্নিত করে বৈধ করা প্রয়াস অব্যাহত। স্টালিন তাঁর একনায়কত্বকে 'হাজার গুণ বেশি গণতান্ত্রিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশের সমাজকে গণতন্ত্রায়ন জন্য সামারিক শাসনকে গণতন্ত্রের প্রস্তুতিপর্ব দেখিয়ে বাংলাদেশে জেনারেল এরশাদ তার সামরিক শাসনকে চিহ্নিত করেছিলেন 'জনগনের সামরিক শাসনরূপে'। গণতন্ত্রে কোন অগণতান্ত্রিক উপাদান সংযোজিত হলে তা গণতন্ত্রকে বিকৃত করে। তবে গণতন্ত্র তার অকৃত্রিমরূপে অগ্রসর হচ্ছে। তাছাড়া গত শতক থেকে গণতন্ত্রের মূল উপাদানগুলো বিকশিত হচ্ছে। একুশ শতকে সম্ভবত অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গণতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হবে ব্যতিক্রমভাবে।

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রায়নের দ্বিতীয় প্রবাহের সূচনা হয় ১৯৫০-৫৯ শতকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যেই সে শতকের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু প্রবণতা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক নাগপাশ ছিন্ন করে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র একে একে আত্মপ্রকাশ করল। জাতিসংঘের ভূমিকাও ক্রমে ক্রমে অর্থপূর্ণ হয়ে

উঠল। গণতন্ত্রও সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠল। তবে বাংলাদেশের বর্তমান গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার তুলনায় **১৯৭২** সালের সংবিধানের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়াটি ছিল অনেক বেশি মৌলিক ও গভীর। **(এমাজউদ্দীন আহমদ,২০১৭)**

৩.৬ বাংলাদেশ সংবিধান ও গণতন্ত্র

১৯৭২ সালের **১৬ই** ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ হয়েছে। **১৯৭২** সালের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে একটি মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তিত হয়। তবে **১৯৭৫** সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আবির্ভাব ঘটে। আবার **১৯৯১** সালের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু বর্তমান সংবিধানের সংসদ সদস্যগণের দল পরিবর্তনের উপর কঠোর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করা হয়েছে বলে কার্যত তিনি কোন ক্ষমতার অধিকারী নন। কালাক্রমে বর্তমানে আমাদের সংবিধান যে অবস্থায় পৌঁছেছে তার তুলনায় **১৯৭২** সালের সংবিধানটি ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ। **(রহমান, ১৯৯৮)**

গণতন্ত্র হচ্ছে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, যা জনগণের অংশগ্রহণ, সম্মতি ও জবাবদিহিতার ভিত্তিকে পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রাধান মূলনীতিগুলোর একটি। গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে বাংলাদেশ সংবিধানের **১১** অনুচ্ছেদে বলা হয়, ‘প্রজাতন্ত্র (বাংলাদেশ) হবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা এবং মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্য এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগনের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত থাকবে’**(রশিদ, ২০০১)**।

Article: 11. Democracy and human rights: *The Republic shall be a democracy in which fundamental human rights and freedoms and respect for the dignity and worth of the human person shall be guaranteed and in which effective participation by the through their elected representatives in administration at all levels shall be ensured.*
(রহমান, ২০১১ ও অনুচ্ছেদ-১১, বাংলাদেশ সংবিধান)

গণতন্ত্র, বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রকে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী শ্রেষ্ঠ সরকারব্যবস্থা মনে করেন। সম্ভবত তিনি সুদীর্ঘ এগারো বছর আসাম আইনসভার সদস্য থাকাকালে সংসদীয় গণতন্ত্রের

অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি মনে করেন যে, “ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্যই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন।” তবে তাঁর গণতন্ত্র হলো জনগণের গণতন্ত্র। সেজন্যই তিনি বাংলাদেশের জনগণের হিতে অক্লান্ত পরিশ্রমও করেছেন। তিনি বলেন, “গণতন্ত্রের নিয়ম- যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা সংখ্যা বেশি, তারাই দেশ শাসন ও পরিচালনা করবে। এই দেশে গরীব,কৃষক ও মজুরের সংখ্যা শতকরা ৯৫ ভাগ। তারাই এ দেশের শাসক হতে পারে। অন্য কেউ নয়।” মাওলানা ভাসানীর গণতন্ত্রচিন্তাকে বিশ্লেষণ করলে সাতটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। তা হলো:

- রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অধিকার জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে;
- যুক্তনির্বাচন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভা নির্বাচিত হয়;
- আইন পরিষদ ব্যক্তির মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে;
- সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে না; আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের ক্ষমতা পৃথকভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে;
- প্রত্যেক নাগরিক চলাচল, বাকস্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমিতি অনুষ্ঠান, সমিতির গঠন ও ধর্মঘট পালনের পূর্ন অধিকার ভোগ করে;
- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব হয় না এবং
- সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করে।

মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কখনো গণতন্ত্রের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। তিনি গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলের প্রধানত এ কারণে যে, তিনি মনে করেন- রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ ও ত্যাগের সর্বাপেক্ষা সুসভ্য পন্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নিরপেক্ষ ও দূর্নীতিমুক্ত নির্বাচন।

গণতন্ত্রকে ভিত্তি করে পূর্ববাংলার জনসমষ্টিকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিগোষ্ঠীতে পরিণত করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি চেয়েছিলেন শোষিতের গণতন্ত্র কায়েম করতে—যে গনতন্ত্র শোষিত মানুষের জন্য,

তাদের স্বার্থে ও তাদের দ্বারা পরিচারিত হবে। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। গণতন্ত্র- সেই গণতন্ত্র যা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকে। আগেও আমরা দেখেছি গণতন্ত্র যেসব দেশে চলছে, দেখা যায়, সেই সব দেশে গণতন্ত্র পুঁজিপুতিদরে প্রটেকশন দেয়ার জন্য কাজ করে এবং সেখানে প্রয়োজনে শোষকদের রক্ষা করার জন্যই গণতন্ত্রের ব্যবহার। সেই গণতন্ত্র আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা চাই শোষিতের গণতন্ত্র....যাতে এদেশের দুঃখী মানুষ রক্ষা পায়।.....অনেক আলোচনা হয়েছে যে, কারোর সম্পত্তি কেউ নিতে পারবে না। কিন্তু যে চক্র দিয়ে মানুষকে শোষণ করা হয়, সেই চক্রকে আমরা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে চাই। তার জন্য আমরা প্রথমেই ব্যাংক, ইনসুরেন্স, কাপড়ের কল, পাটকল, চিনির কারখানা সবকিছু জাতীয়করণ করে ফেলেছি।"
শেখ মুজিবুর রহমানের সংজ্ঞানুসারে বুঝা যায় যে তাঁর গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো সমাজতন্ত্র। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর শোষিতের গণতন্ত্র জনসাধারণের মৌলিক রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। তিনি পাকিস্তান আমলের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয় ইংল্যান্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রের আদলে। খসড়া সংবিধানের সূচনাতে তিনি বলেন, "এমন একটি যথার্থ সজীব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবেযেখানে জনগণ স্বাধীনতা ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করবে এবং ন্যায় সাম্য বিরাজ করবে।"

এছাড়া তিনি বিবেকের স্বাধীনতা, ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা, জনগণের স্বাধীনতা ও চলাচলের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শেখ মুজিব শোষিতের গণতন্ত্রের রূপরেখা সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। **(সৈয়দ মকসুদ আলী,১৯৮৮)**

৩.৭ বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

সংক্ষিপ্তাকারে বাংলাদেশ সংবিধানের ১৬টি সংশোধনীঃ

আইনের শিরোনাম	সংশোধনীর বিষয়বস্তু	উত্থাপনকারী	উত্থাপনের তারিখ	পাসের তারিখ	রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের তারিখ	পক্ষে-বিপক্ষে ভোট	মন্তব্য
সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন ১৯৭৩	যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য মানবতাবিরোধী আপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করা।	আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন।	১২ই জুলাই, ১৯৭৩	১৫ই জুলাই ১৯৭৩	১৭ই জুলাই ১৯৭৩	২৫৪-০ (বিরত ৩ জন)	***
সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৭৩	অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বা বহিরাক্রমনে দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবন বাধাগ্রস্ত হলে "জরুরি অবস্থা"ঘোষণার বিধান	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	২৬৭-০ (স্বতন্ত্র ও বিরোধীরা ওয়াকআউট করেন)	***
সংবিধান (তৃতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৭৪	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন এবং চুক্তি অনুযায়ী ছিটমহল ও অপদখলীয় জমি বিনিময় বিধান	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	২১শে নভেম্বর, ১৯৭৪	২৩শে নভেম্বর ১৯৭৪	২৭শে নভেম্বর ১৯৭৪	২৬১-০৭	***
সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) আইন ১৯৭৫	সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন পদ্ধতি চালু এবং বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি প্রবর্তন এবং বাকশাল গঠন।	আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর	২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫	২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫	২৫শে জানুয়ারি ১৯৭৫	২৯৪-০	***

সংবিধান (পঞ্চম সংশোধনী) আইন ১৯৭৯	১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকান্ডকে বৈধতা দান,"বিসমিল-াহির রাহমানির রাহিম" সংযোজন ।	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	৪ই এপ্রিল ১৯৭৯	৬ই এপ্রিল ১৯৭৯	৪ই এপ্রিল ১৯৭৯	২৪১-০	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত।
সংবিধান (ষষ্ঠ সংশোধনী) আইন ১৯৮১	উপ-রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ	সংসদ নেতা শাহ আজিজুর রহমান	১লা জুলাই ১৯৮১	৮ই জুলাই ১৯৮১	৯ই জুলাই ১৯৮১	২৫২-০	***
সংবিধান (সপ্তম সংশোধনী) আইন ১৯৮৬	১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ই নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে প্রণীত সকল ফরমান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের আদেশ, নির্দেশ ও অধ্যাদেশসহ অন্যান্য সকল আইন অনুমোদন	আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বিচারপতি কে এম নুরুল ইসলাম	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	২২৩-০	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত
সংবিধান (অষ্টম সংশোধনী) আইন ১৯৮৮	রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দান ও ঢাকার বাইরে ৬টি জেলায় হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca-এর নাম Dhaka এবং Bangali-এর নাম Bangla-তে পরিবর্তন করা হয়।	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	১১ই মে ১৯৮৮	৭ই জুন ১৯৮৮	৯ই জুন ১৯৮৮	২৫৪-০	***

সংবিধান (নবম সংশোধনী) আইন ১৯৮৯	রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের সাথে একই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, রাষ্ট্রপতি পদে কোন ব্যক্তিকে পর পর দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা	সংসদ নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	৬ই জুলাই ১৯৮৯	১০ই জুলাই ১৯৮৯	১১ই জুলাই ১৯৮৯	২৭২-০	***
সংবিধান (দশম সংশোধনী) আইন ১৯৯০	রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে ১৮০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে সংবিধানের ১২৩(২) অনুচ্ছেদের বাংলা ভাষ্য সংশোধন ও সংসদে মহিলাদের ৩০টি আসন আরো ১০ বছরকালের জন্য সংরক্ষণ	আইন ও বিচারমন্ত্রী হাবিবুল ইসলাম	১০ই জুন ১৯৯০	১২ই জুন ১৯৯০	২৩শে জুন ১৯৯০	২২৬-০	***
সংবিধান (একাদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯১	অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান	আইন ও বিচারমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ	২রা জুলাই ১৯৯১	৬ই আগস্ট ১৯৯১	১০ই আগস্ট ১৯৯১	২৭৮-০	***
সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯১	সংসদীয় পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তন ও উপরাষ্ট্রপতি পদ বিলুপ্তি	প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া	২রা জুলাই ১৯৯১	৬ই আগস্ট ১৯৯১	১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১	৩০৭-০	***
সংবিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) আইন ১৯৯৬	অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নিরপেক্ষ-নিদর্লীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন	আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার	২১শে মার্চ ১৯৯৬	২৭শে মার্চ ১৯৯৬	২৮শে মার্চ ১৯৯৬	২৬৮-০	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত

সংবিধান (চতুর্দশ সংশোধনী) আইন ২০০৪	নারীদের জন্য সংসদে ৪৫টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংরক্ষণ, অর্থ বিল, সংসদ সদস্যদের শপথ, সাংবিধানিক বিভিন্ন পদের বয়স বৃদ্ধি	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ	২৭শে মার্চ ২০০৪, দ্বিতীয়বার ২৮শে এপ্রিল ২০০৪	১৬ই মে ২০০৪	১৭মে ২০০৪	২২৬-১	***
সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধনী) আইন ২০১১	সংবিধানের প্রস্তাবনা সংশোধন, ১৯৭২-এর মূলনীতি পূনর্বহাল, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তকরণ, ১/১১ পরবর্তী দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ম বহির্ভুতভাবে ৯০ দিনের অধিক ক্ষমতায় থাকার বিষয়টি প্রমার্জ্জনা, নারীদের জন্য সংসদে ৫০ টি সংসদীয় আসন সংরক্ষণ, নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমদ	২৫শে জুন ২০১১	৩০শে জুন ২০১১	৩রা জুলাই ২০১১	২৯১-১	***
সংবিধান (ষোড়শ সংশোধনী) আইন ২০১৪	১৯৭২ সালের সংবিধানের ৯৬ অনুচ্ছেদ পুনঃস্থাপনের মাধ্যমে বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদকে ফিরিয়ে দেয়া	আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক	৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪	১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪	২২ সেপ্টেম্বর ২০১৪	৩২৮-০ [১]	সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত এবং বাতিলকৃত

(রহমান, ২০১১)

৩.৮ বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর রিভিউ

বাংলাদেশে সংবিধানে ১৯৯১ সালের ৬ আগষ্ট আরেকটি সংশোধনী আনা হয়। এটি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী। এ সংশোধনীর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সংশোধনী বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে বিরল ঐতিহাসিক নজীর স্থাপন করে। এ সংশোধনীর মূল প্রতিপাদ্য বিসয় হলো- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

ব্যবস্থার পরিবর্তে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। **১৯৯১** সালের ৬ আগষ্ট ৩০৭-০ ভোটে এ সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর প্রধান প্রধান দিকগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

১. সংসদীয় সরকারঃ দ্বাদশ সংশোধনীর প্রধান দিক হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ সংশোধনীর দ্বারা বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

২. নামমাত্র রাষ্ট্রপতিঃ এ সংশোধনীর দ্বার বাংলাদেশ একজন নামমাত্র রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। তিনি আইনানুসারে সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন। তিনি যাবতীয় বিষয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।

৩. রাষ্ট্রপতির মেয়াদঃ এ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির মেয়াদ নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রপতি ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। একাধিক্রমে তিনি **১০** বছরের বেশি ক্ষমতায় থাকবেন না।

৪. **উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বিলোপঃ** উপ-রাষ্ট্রপতি পদ বিলোপ দ্বাদশ সংশোধনীর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। দ্বাদশ সংশোধনীর দ্বারা উপ-রাষ্ট্রপতি পদটি বিলোপ করা হয়। এ সংশোধনীতে বলা হয়, কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূণ্য হলে জাতীয় সংসদের স্পীকার অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

৫. মন্ত্রিসভা গঠনঃ মন্ত্রিসভা গঠন পদ্ধতি সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর একটি বিশেষ দিক। এ সংশোধনীতে বলা হয় বাংলাদেশ সরকার ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রিসভা থাকবে। রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করবেন। তিনি হবেন মন্ত্রিসভার নেতা।

৬. গণভোট পদ্ধতিঃ এ সংশোধনীতে গণভোট পদ্ধতির কথা বলা হয়। দ্বাদশ সংশোধনী দ্বারা কেবল প্রস্তাবনা, সংবিধানের প্রস্তাবনা, অনুচ্ছেদ ৮,৪৮, ৫৬ ও **১৪২** সংক্রান্ত কোন বিল গণভোট আকারে পেশ করার বিধান রাখা হয়।

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে একটা সাধারণ ঐক্যমত ছিল। **১৯৭২** সালে বাংলাদেশে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। **১৯৭৫** সালের জানুয়ারি মাসে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। **১৯৯১** সালে পুনরায় দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়। এভাবে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গণতন্ত্রের সম্ভাবনার মাত্রা আরো গতিশীল করে। **(হক, ২০০৭)**

৩.৯ সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা (১৯৭৩-৭৫)

১৯৭২ সালের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার (Parliamentary System of Government) প্রবর্তিত হয়। রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত এবং মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলনীতি হলো সংসদের প্রাধান্য। **১৯৭৩** সালের মার্চ মাস হতে **১৯৭৫** সালের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি চালু ছিল। এ সময়কালে সংসদের কার্যক্রম ও রাজনৈতিক দলসমূহের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

১. **আইন প্রণয়ন:** ১৯৭৩-৭৪ সংসদীয় আমলে জাতীয় সংসদ মোট ৭টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং **১১২**টি বিল পাস হয়। এগুলোর মধ্যে ৫৫টি (৪৯%) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পূর্বাহ্নে অধ্যাদেশ হিসেবে জারি করা হয় এবং সংসদে অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। উক্ত **১১২**টি বিলের মধ্যে ৩৭টি (৩৩%) সংসদে সংশোধিত আকারে এবং বাকি ৬৭% সংশোধনী ছাড়াই গৃহীত হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিলগুলো দ্রুত পাশ হয়ে যায়, কিন্তু সংসদ সদস্যগণ আলোচনার সুযোগ পাননি।

২. **নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ:** সংসদীয় আমলে ৩৪৩টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ দেয়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ প্রস্তাবই ক্ষমতাসীন দলের সদস্যগন কর্তৃক প্রত্যাহৃত হয়। তাই নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে পারে নি। অতএব, সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী সংসদ তার দায়িত্ব পালন করতে পারেনি।

৩. **সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের স্বল্পতা: ৩১৫** জন সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯ জন। এ স্বল্পতার কারণে তাঁরা সরকারের কার্যক্রমের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারেন নি। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যদের স্বল্পতার কারণে তাঁরা কোন অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত করতে পারেনি।

৪. **দলীয় রাজনীতি: ১৯৭৩-৭৫** সময়কালে রাজনৈতিক দলসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অনুকূল ছিল না। অন্যান্য বিরোধী দলগুলো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করত না। তারা বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ফলে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়।

৫. **সাংবিধানিক বাধানিষেধ:** সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বিধান ছিল, কোন সংসদ সদস্য নিজ দলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তিতে তা পরিলক্ষিত হয় নি। ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা লোপ পায় ।**(হক, ২০০৭)**

সুতরাং বাংলাদেশ সংবিধানের গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন। কিন্তু জনগণ প্রত্যক্ষভাবে শাসন করে না। শাসন করে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে প্রজাতন্ত্রে গণতন্ত্র বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানে জনগণের শাসন তথা গণতন্ত্রের চর্চা সঠিকভাবে হচ্ছে না। তাই বাংলাদেশ সংবিধানের ক্ষেত্রে গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার বিষয়টি নতুন ও বিশ্লেষণের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ

৪.১ তথ্য ও উপাত্তের উৎস

আমার গবেষণায় মূলত মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source) হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ, গবেষণা পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণের জন্য মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ও উপাত্ত আমার গবেষণার গতিকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও পত্রপত্রিকা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ মাধ্যমিক উৎস (Secondary Source)-র মাধ্যমে আমি আমার গবেষণা **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ"** বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছি।

৪.২ তথ্য বিশ্লেষণ ও সাহিত্য পর্যালোচনা

আমি আমার গবেষণার বিষয়টি নিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ ও সাহিত্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে যেসব বইপুস্তক, প্রবন্ধ, জার্নাল, লেখকের প্রতিবেদন থেকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করেছি উদাহরণস্বরূপ কিছু সাহিত্য ছক আকারে তুলে ধরা হলো-

বইয়ের নাম ও প্রকাশকাল	**লেখকের নাম**	**বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনী সম্পর্কে যে যে বিষয়ের কথা বলা হয়েছে**
১. বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, ১৯৯৮	ড. মোঃ শফিকুর রহমান	➢ বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন ও স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র। ➢ ১৯৭২ সাল অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ➢ গণপরিষদ আদেশ ➢ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ➢ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ➢ খসড়া সংবিধান সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ ➢ প্রস্তাবনা ➢ প্রজাতন্ত্র ➢ সাংবিধানিক প্রাধান্য ➢ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি

		➢ মৌলিক অধিকার ➢ মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ ➢ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ➢ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা ➢ জাতীয় সংসদ ➢ সংবিধান সংশোধনীসমূহ (১-১৬টি, সংশোধনীর কারণ, প্রেক্ষাপট)
২. বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি,২০০৭	ড. আবুল ফজল হক	➢ সংবিধান প্রণয়ন ➢ খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি ➢ খসড়া সংবিধান ও সাধারণ প্রতিক্রিয়া ➢ গণপরিষদে বিতর্ক ➢ সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া ➢ সংবিধান লাভের পদ্ধতি ➢ ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ➢ সংবিধান সম্পর্কে ঐক্যমতের প্রকৃতি ➢ বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ➢ প্রস্তাবনা ➢ ১ম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র ➢ ২য় ভাগঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ➢ মূলনীতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ➢ মূলনীতির তাৎপর্য ➢ ৩য় ভাগঃ মৌলিক অধিকার ➢ ৪র্থ ভাগঃ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা ➢ ৫ম ভাগঃ জাতীয় সংসদ ও কার্যাবলী ➢ ৬ষ্ঠ ভাগঃ বিচার বিভাগ ➢ ৭ম ভাগঃ নির্বাচন ➢ ৮ম ভাগঃ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ➢ ৯ম ভাগঃ কর্ম বিভাগ ➢ ১০ম ভাগঃ সংধিান সংশোধন (১-১৫) ➢ সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা
৩. বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও	ড. হারুন-অর-রশিদ	➢ সংবিধান রচনার পটভূমি ও পদক্ষেপ ➢ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ➢ গণপরিষদের গঠন, কার্যক্রম ও সংবিধান প্রণয়ন ➢ প্রস্তাবনা ➢ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন, ২০০১		➢ পরিবর্তিত রূপ ➢ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ➢ মূলনীতির পরিবর্তিত রূপ ➢ মূলনীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ➢ মৌলিক অধিকার ও তাৎপর্য ➢ মৌলিক অধিকার বলবৎ করার উপায় ➢ সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি ➢ সংবিধান সংশোধনীর আবশ্যকতা ➢ সংবিধান সংশোধনী (৫ম-১০ম) এবং ১৩ম।
৪. বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, ১৯৮৯	ড. মোঃ আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া	➢ বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস ➢ গণপরিষদ আদেশ ➢ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ➢ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন ➢ খসড়া সংবিধানের উপর রাজনৈতিক দলের অভিমত ➢ খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত অনুমোদন ➢ ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ➢ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ➢ মূলনীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য ➢ ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্র সম্পর্কিত বিধান ➢ ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে জাতীয় সংসদ ➢ শাসন বিভাগের সাথে জাতীয় সংসদের সম্পর্ক ➢ সংবিধান সংশোধনী পদ্ধতি ➢ সংবিধান সংশোধনী (১-১৩) সংশোধনীর কারণ, প্রেক্ষাপট)।
৫. সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, সাংবিধানিক আইন ও বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১১	মোঃ মিজানুর রহমান, এ্যাডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	➢ প্রবাসী সরকার গঠন ➢ বাংলাদেশ সংবিধান প্রতিষ্ঠা ➢ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ➢ ১৯৭২ সালের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ➢ ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ ➢ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন ➢ গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন

		➢ খসড়া সংবিধান সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে উত্থাপিত সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ ➢ ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য ➢ বাংলাদেশ সংবিধানের বর্তমান বৈশিষ্ট্য ➢ সংক্ষিপ্তাকারে ১৬টি সংশোধনী ➢ সংবিধান সংশোধনী (১-১৬টি) ➢ ১ম ভাগঃ প্রজাতন্ত্র ➢ ২য় ভাগঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ➢ ৩য় ভাগঃ মৌলিক অধিকার ➢ ৪র্থ ভাগঃ নির্বাহী বিভাগ ➢ ৫ম ভাগঃ আইনসভা ➢ ৬ষ্ঠ ভাগঃ বিচার বিভাগ ➢ ৭ম ভাগঃ নির্বাচন ➢ ৮ম ভাগঃ মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক ➢ ৯ম ভাগঃ বাংলাদেশের কর্ম বিভাগ ➢ ১০তম ভাগঃ সংধিান সংশোধন ➢ ১১তম ভাগঃ বিবিধ ➢ তফসিল (৭টি)।
৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ২০১৬	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।	➢ বাংলাদেশে সংবিধানের বিধানসমূহ ও সংশোধনী (সর্বশেষ সংশোধনী মুদ্রিত, এপ্রিল, ২০১৬)
৭. রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৫ বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন **(BPO-6305)**	ড. হারুন-অর-রশিদ, ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, ইয়াসমিন আহমেদ ও শান্তনু মজুমদার	➢ বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ➢ বাংলাদেশ সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ➢ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ ➢ নির্বাহী বিভাগ ➢ আইনসভা ও বিচার বিভাগ

গবেষণার বিশ্লেষণ ও লক্ষ্য অর্জনে পরোক্ষভাবে যেসব গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে তার ছক:

বইয়ের নাম ও প্রকাশকাল	**লেখকের নাম**	**গবেষণা বিশ্লেষণ ও গণতন্ত্রের বিষয়ে যা যা বলা হয়েছে**
১. সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি, ২০০২	অধ্যাপক আব্দুল মান্নান, সামসুন্নাহার খানম মেরী	➢ গবেষণা পদ্ধতি ➢ গবেষণা নকশা ➢ সাহিত্য পর্যালোচনা ➢ গবেষণার বিশ্লেষণ
২.রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, ১৯৮৮	ড. সৈয়দ মকসুদ আলী	➢ মাওলানা ভাসানীর গণতন্ত্রচিন্তা ➢ শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র
৩. বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, ২০১৭	ড. এমাজউদ্দীন আহমদ	➢ বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ও গণতন্ত্রায়নের প্রবাহ।
৪. গণতন্ত্র: সংকট ও উত্তরণ,২০০৯	ধীরাজ কুমার নাথ	➢ গণতন্ত্রের সংকট, উত্তরণ ও গণতন্ত্রায়ন।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

৫.১ আলোচনা

সংবিধান অনুসারে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ। জনগণের জন্য সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর করতে হবে। জনগণের ইচ্ছার পরম অভিব্যক্তি হিসেবে গণতন্ত্র হবে জনগণের প্রকৃত শাসন ব্যবস্থা। আমার মতে, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তখনই সাফল্য অর্জন করবে যখন বাংলাদেশের গণতন্ত্রে জনগণের সকল চাহিদা পূরণ হবে এবং নিম্নোক্ত শর্তাবলী পরিলক্ষিত হবে।

১. গণতান্ত্রিক জনগণঃ গণতন্ত্রকে সাফল্যমন্ডিত করতে হলে সার্বাগ্রে যে জিনিসটির প্রয়োজন তাহল জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারণার উপস্থিতি। গণতান্ত্রিক চেতনাই জনগণকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে। আবার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তার সাফল্যের জন্য নাগরিকদের কাছে বিশেষ যোগ্যতাও দাবি করে। এর পরিবর্তে নাগরিকরাও সমৃদ্ধ জীবনের সন্ধান পায়।

২. বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাঃ গণতন্ত্রের সাফল্যে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বিরোধীদলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না। এছাড়া একটি শক্তিশালী বিরোধীদল থাকলে সরকার সবসময় সতর্কাবস্থায় থাকে এবং জনস্বার্থে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয়।

৩. গণতান্ত্রিক পরিবেশঃ মানুষের ব্যক্তিসত্তা পরিপূর্ণাকারে বিকাশের উপযোগী পরিবেশই হল গণতান্ত্রিক পরিবেশ। এর জন্য প্রয়োজন সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অথনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ও সংরক্ষণ। সামাজিক ও অথনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং অন্যায় ও শোষণ গণতন্ত্রের সামাধি রচনা করে।। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক তথা গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া গণতন্ত্রের সাফল্য সুনিশ্চিত হতে পারে না।

৪. আইনের শাসনঃ গণতন্ত্রের সফলতার একটি অন্যতম শত হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা । আইনের চোখে সবাইকে সমানভাবে দেখতে হবে । এতে সকলে সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে এবং গণতন্ত্র সফল হবে।

৫. যোগ্য নেতৃত্বঃ রাজনৈতিক নেতৃবর্গের ন্যায়নীতি ও বেবেকবোধের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল। স্বেচ্ছাচারী নেতৃত্ব গণতন্ত্রের দাফন রচনা করে। এছাড়া দুবল নেতৃত্বের কারণে বহ দেশেই গণতন্ত্র আজ বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। এ কারণে রাষ্ট্রীয় নেতাদের ন্যায়পরায়ণতা, সততা, উদারচিত্ত, বিবেকবান প্রভৃতি গুণাবলি গণতন্ত্রের সাফল্যে পূর্বশত হিসেবে গণ্য হয়।

৬. জনমতঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য আর একটি অপরিহার্য শর্ত হল সুস্থ, সবল ও সদাজাগ্রত জনমত। সদা সতর্ক এবং সক্রিয় জনমত সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করে এবং সরকারকে গণমুখী করে। তাই গণতন্ত্রের সাফল জনমতের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৮. সংখ্যারিষ্ঠতাঃ পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের প্রাণ। গণতন্ত্র সংখ্যারিষ্ঠের শাসন। এ শাসনব্যবস্থাকে সফল করতে হলে সংখ্যালঘিষ্ঠরা যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন মেনে নেবে, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠকেও সংখ্যালঘু তথা বিরোধীদলের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহিষ্ণু মনোভাব পোষণ করতে হবে।

৯. ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণঃ গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণকে অন্যতম শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।

১০. জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যঃ গণতন্ত্রের সফলতার জন্য সামাজিক তথা জাতীয় সংহতি ও ঐক্য আবশ্যক। জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন গণতন্ত্র বিকাশের পক্ষে সহায়ক। তাই জনগণের মধ্যে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্যবোধ ছাড়া গণতন্ত্র সফল হতে পারে না।

৫.২ সুপারিশমালা

“গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ” বিষয়টি দ্বারা গণতন্ত্রায়ন কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা নিরূপণে এবং বাংলাদেশের সংবিধানে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাধাসমূহ চিহ্নিত এবং বাধাসমূহ উত্তরণের জন্যে সুপারিশমালা তৈরি করেছি। বাংলাদেশের গণতন্ত্র গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া যে সমস্ত বাধার সম্মখিন হচ্ছে তার মধ্যে আইন প্রণয়নে বাধা, সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা হ্রাস, নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, দলীয় রাজনীতি, সংসদে বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বের

স্বল্পতা ও সাংবিধানিক বাধানিষেধ অন্যতম। এ সকল বাধা দূরীকরণে গণতন্ত্রকে তুলে ধরার প্রয়াসে সুপারিশমালা নিম্নরূপঃ

- বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতার প্রধান কারণ হলো গণতন্ত্রের প্রতি রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাব। সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সংবিধানের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
- সংসদীয় গণতন্ত্রে গণতন্ত্রায়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সংসদকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা, সংসদকে অবহেলা করে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাবে না। সংসদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- গণতন্ত্রের চর্চা ছাড়া গণতন্ত্রায়ন ক্রমশ মন্থর হয়ে পরে। তাই গণতন্ত্রায়নের ধারাকে গতিশীল করতে গণতন্ত্রের চর্চা করতে হবে।
- সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে সাধারণত দলীয় সরকারের অধীনে। কিন্তু বিরোধী দলগুলোর স্বল্পতার কারণে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রকৃত ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে না। তাই গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করার জন্য গণতান্ত্রিক বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
- বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো সামরিক হস্তক্ষেপ বা সামরিক শাসন। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে সামরিক বাহিনীর শাসন জবরদখলের প্রবণতা হ্রাস করতে হবে।
- সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী বাছাই করতে হবে। যোগ্য ও দক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা রক্ষার্থে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
- গণতন্ত্রায়নের ধারাকে গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো নির্বাচন। সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হবে।
- সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন। তাই জনগণের সকল চাহিদা , মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য অধিকার পূরণ করার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

৫.৩ উপসংহার

সংবিধান হলো একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন। দেশের সকল আইনের উর্ধ্বে এর অবস্থান। যদি কোন আইন সংবিধানের অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে ঐ আইনের যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু বাতিল বলে গণ্য হবে। সংবিধান সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান না থাকলে একজন মানুষকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পর **১৯৭২** সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচনা করা হয়। এরপর দেশের পরিবর্তিত অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে এ পর্যন্ত **১৬**টি সংশোধনী আনায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি সংশোধনী কোন না কোন পরিস্থিতির ভিত্তিতে এসেছে।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। এতে জনগণের সকল মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। তবে বর্তমানে গণতন্ত্রের গণতন্ত্রায়ন প্রক্রিয়া সঠিক ভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে না। কালাক্রমে বর্তমানে আমাদের সংবিধান যে অবস্থায় পৌঁছেছে তার তুলনায় **১৯৭২** সালের সংবিধানটি ছিল অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ।

অতএব, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তখনই সাফল্য অর্জন করবে যখন বাংলাদেশের গণতন্ত্রে জনগণের সকল চাহিদা পূরণ হবে ও জনগণের মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত হবে এবং সকল স্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করবে। সংবিধান সংশোধনীসমূহ বাংলাদেশের গণতন্ত্রায়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করছে সেটি নিরূপণে আমার গবেষণা **"গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ: একটি বিশ্লেষণ"** বিষয়টি যৌক্তিক ও নতুনত্বের দাবিদার। আমি আশা করি, আমার গবেষণা দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশোধনীসমূহ এ দেশের গণতন্ত্রায়নে কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে সেটি নিরূপণের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

৫.৪ তথ্য নির্দেশিকা

১. রহমান, এম. এস (১৯৯৮) বাংলাদেশের আইন বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, ঢাকা-চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাউস।

২. হক, এফ. আবুল (২০০৭) বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা: অনন্যা।

৩. রশিদ, এ. হারুন (২০০১) বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন।

৪. ভূঁইয়া, এ. ওদুদ (১৯৮৯) বাংলাদেশের রাজনেতিক উন্নয়ন, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো।

৫. রহমান, এম. এম (২০১১) সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ, সাংবিধানিক আইন ও বাংলাদেশের সংবিধান, ঢাকা: সুফি প্রকাশনী।

৬. লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (২০১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

৭. বাউবি কর্তৃক প্রকাশিত বই, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান-৫) বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন (BPO-6305)।

৮. মান্নান, এ. ও মেরী কে. এস (২০০২) সামাজিক গবেষণা ও পরিসংখ্যান পরিচিতি, ঢাকা: অবসর।

৯. আলী, এম. এস (১৯৮৮) রাজনীতি ও রাষ্ট্রচিন্তায় উপমহাদেশ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদারস।

১০. আহমদ, এ. উদ্দীন (২০১৭) বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, ।

১১. নাথ, কে. ডি (২০০৯) গণতন্ত্র: সংকট ও উত্তরণ, ।

১২. সুম্পিটার (১৯৫০) ক্যাপিটালিজম, সোশ্যালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি।

১৩. ডাল, আর. (১৯৮৯) Dremocracy and Its Creties.

১৪. Everson, S. (1996) Aristotle. The Politics and The Constitution of Athens. Cambridge: Cambridge University Press,.

১৫. Lipson, L. (1969) The Democratic Civilization, Oxford University Press.

১৬. Bangladesh Observer, 1972.

১৭. Holiday Dhaka,1972.

১৮. প্রথম আলো, ২০১৭।